# ‘শিশুরা করে খেলা’, খেলা করে না

অশ্রুকুমার শিকদার

রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’-র ‘শিশু ভোলানাথ’ -এর কবিতায় পাই আমরা নিশ্চিন্ত পরিপূর্ণ স্থিতিশীল সমাজ আর পরিবারজীবনের ছবি। মাথার উপরে ছাদ আছে, খাবারের অভাবের কথা ভাবাই যায় না। চিন্তামুক্ত জীবন, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে পারে এমন সম্ভাবনার প্রশ্নই ওঠে না। প্রধানত খোকারা, খুকুরাও, বাবা-মায়ের স্নেলের নিরাপত্তার আবেষ্টনে বেড়ে উঠছে।

কিসের সুখ সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার- পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি। (খেলা)

এই নিরুপদ্রব জগতের ছোটদের ইচ্ছে করে কুকুরছানা হতে, টিয়েপাখি হতে, ফেরিওলা, মালি কিংবা পাহারাওলা হতে কিংবা রাজমিস্ত্রি হতে যে, ‘ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর/খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গড়ে।’ তাদের ইচ্ছে করে কানাইমাস্টার হয়ে বেড়ালকে লেখাপড়া শেখাতে, খেযাঘাটের মাঝি কিংবা ইচ্ছমতী নদী হতে, কাস্তে হাতে চুবড়ি মাথায় কৃষাণের ছেলে হতে। কল্পনায় তারা দুষ্টমি করে চাঁপাগাছে চাঁপাফুল হয়ে ফুটতে চায়, ডাকাতকে হারিয়ে দেওয়া বীরপুরুষ হতে ইচ্ছে করে। তাদের দুঃখ অনেক মৃদু, অনেক নরম।

বাছার চোখে জল আসে কখন? লিখতে গিয়ে গায়ে কালি লাগানোয় কেউ যদি নোংরা বলে তাহলে বা খেলতে গিয়ে কাপড় ছিঁড়লে, কেউ লক্ষ্মীছাড়া বললে বা মিষ্টি ভালোবাসে বলে কেউ তাকে লোভী বললে। এইসব কবিতায় পুজোর সময় গরিবের ছেলে বড়লোকের ছেলের মতো সাটিনের জামা না পেয়ে সামান্য ছিটের জামা পেলে দুঃখ পায়। মা গরিব ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে।

আয় বিধু আয় বুকে  চুমো খাই চাঁদমুখে
তোর সাজ সবচেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে  দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো। (পূজার সাজ)

এই ছোটদের জীবনে সবচেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ মাতৃহীন হওয়ায়। যে মা স্নেহ দিয়ে আগলে রাখত, যে মায়ের কোলে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, সেই মায়ের অভাবে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় ছোটদের।

এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া—
সেইখানে তুই আয় মা, ফিরে আয়—
এত ডাকি, দিবি নে কি সাড়া। (আকুল আহ্বান)

‘রাত হল, আঁধার হয়ে আসে’, ‘শূনে নয়ন শূন্য পানে চায়’। মা নেই বলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না, মাকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে শিশু নেতিয়ে পড়ে ঘুমে। মাতৃহীন শিশুর কাছে ‘পুজোর গন্ধ আসে সে তাই। মায়ের গন্ধ হয়ে’। ‘শিশু’-র কবিতাগুলি মেজোমেয়ে রানীর অসুখের সময় লেখা। আর আমেরিকার ‘বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসে তিনি লিখেছেন ‘শিশু ভোলানাথ’ -এর কবিতাগুলি। বস্তুগ্রাস থেকে মুক্তির জন্য ‘আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে - লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।’

একশো বছর পরে আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন কতই পালটে গেছে! পাশাপাশি মেলালে আর মেলানো যায় না, দুটো অচেনা জগৎ। সেই আগাপাস্তালা বদলে যাওয়া পরিবার জীবন শিশুজীবনের কিছু ছবি আমরা পেয়ে যাই শঙ্খ ঘোষের ‘ছড়াসমগ্র’ -র অন্তর্গত অনেক - অনেক ছড়ায়। আমাদের এখনকার শিশুরা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হয়ে ছুটির দিনগুলি কাটায়,

অল্প কটা মুদ্রা নে—
মিউজিয়ামে, চিড়িয়াখানা
বিধান—শিশু-উদ্যানে। (কলকাতা)

ইস্কুলের দিনে মা পইপই করে বলে দেয়

টিফিনের বাস্কতে ডিমরুটি রাখা
ইস্কুলে নিস্ খুলে কৌটোর ঢাকা—(টিফিন১)

সব সময় ভালো দামি পুষ্টিকর খাবার খেয়ে-খেয়ে ক্লান্ত এই বালক-বালিকারা বন্ধুদের সঙ্গে মিলে অবলীলায় টিফিনের দামি খাবার ড্রেনে ঢেলে দিয়ে মুখ মুছতে পারে। বাড়িতে ও ‘মা তো দিল ছানা খেতে, আর রুটি কটা’, তারও সৎগতি হয় জানালার ফাঁক দিয়ে। তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়া ছানারুটি নীচের থাকা মালির মাথায় পড়ে আর মালি নালিশ না করে পারে না। সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতির সংসর্গ খরিদ করে নিতে পারে শহুরে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত,

দেখে প্রাণ  মন জুড়োল
চোখে ঘুম  পুঞ্জ হলো
বাতাসের  গুঞ্জরণে

ঘুমোলাম চায়ের বনে। (ভ্রমণ কথা ৫)

কখনো-বা শৌখিন শিশুশ্রমিক সাজে আমাদের সন্তানেরা।

ছোট্ট একটি বালতি হাতে
জল ভরে নাও কলতলাতে
আর তো কোন ভাবনাই নাই
ঘর ধোয়া আর মোছা নিয়া। (গোছানিয়া)

সত্যিকারের শিশু শ্রমিকের শ্রমক্লান্তি, গ্লানি আর অপমানের সঙ্গে, তাদের কষ্টের জীবনের সঙ্গে এই শৌখিন শ্রমিকদের পরিচয় হতে পারে না। নিজেদের আবাসনগুচ্ছের বাইরে থাকে যে বস্তিজীবন, যে-বস্তি থেকে সরবরাহ হয় শিশুশ্রমিকেরা, সেই বস্তির সঙ্গে পরিচয় থাকে না তিনতলা—চারতলা—দশতলা এইসব স্কুল-ইউনিফর্ম-পরা বা বাহারি জামাকাপড় -পরা শিশুদের। পাড়ায় আগুন লাগলে যখন সেই অচেনা বস্তির লোকেরা 'শব্দ না করে নিজে জ্বলেপুড়ে নেভাল অকালবহ্নি', তখন বস্তির মানুষকে এক লহমার জন্য চেনা যায়, তখন বোঝা যায় ভাগ্যে পাশে ছিল এই বস্তি!

দুই

সেটা ১৯৫৪-৫৫ সালের কথা। আমি তখন কলকাতায় এক কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে কয়েক মাসের জন্য এক মোক্ষম অপছন্দের চাকরি করছি। থাকি মহাত্মা গান্ধি রোডের উপরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউসে। যাতায়াতের পথে দেখি, এখনো সেটি ভাঙা পড়েনি। পরে জেনেছি কবি জীবনানন্দ কিছুদিন সেখানে বসবাস করেছিহেন। সেইখানে থাকাকালীন এক পক্ষকাল সময় ধরে আমি ডস্টয়েভস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ উপন্যাস ইংরেজি তর্জমায় পড়েছিলাম। জীবনে আর কোনও দিন উপন্যাস পড়ে আমার এমন আচ্ছন্ন অবিভূত অবস্থা হয়নি। ওই পনেরো দিন আমি যে এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। কলকাতা শহর, চাকরিস্থল, রাস্তাঘাট, বন্ধুবান্ধব সব যেন অলীক হয়ে গিয়েছিল, একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছিল কয়েকটি নরনারী—দ্‌মিত্রি, অহিভান, আহ্যোশা, ফাদার জোশিমা, শ্নেরডিয়াকভ আর, গ্রুশেংকা। খালি মনে হতো, কখন সব অবান্তর কিছু ফেলে আবার বইটা নিয়ে বসব এবং ওইসব নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি হবো, তাদের ভবিতব্যের ভাগিদার হব।

এতদিন পরে সেই উপন্যাসের পাতা উলটাতে - উলটাতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। আইভান কারামাজভ অপাপবিদ্ধ ছোটভাই আল্যোশার কাছে জানতো চাইছে, 'ধরো মানবনিয়তির এক স্থাপত্য নির্মাণ করতে চাইত। তোমার লক্ষ্য সমস্ত মানুষকে সুখী করা, তাদের শান্তি দেওয়া, তাদের বিশ্রাম আর অবকাশ দেওয়া। আর এই নির্মাণ গড়ে তুলবার জন্যে একটি ছোট শিশুকে উৎপীড়ন না করলে তোমার চলবে না। এই মহৎ নির্মাণের জন্য শর্ত হচ্ছে, এই ছোট শিশুটিকে কষ্ট তোমাকে দিতেই হবে। ওই শিশুর চোখের জলের উপর গড়ে তুলতে হবে তোমার মহিমাময় স্থাপত্য। এই শর্তে কি তুমি সম্মত হবে ওই গরিমাময় নির্মাণ গড়ে তুলতে?' আল্যোশা এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলে, 'না' —এই শর্তে সে আদৌ রাজি নয়; তাতে গড়ে না উঠুক ওই মহৎ নির্মাণ। বড়ো ভাই দ্‌মিত্রি নিজের হাতে খুন করেনি বটে, কিন্তু দুষ্ক্রিয়াসক্ত বাবাকে সে খুন করতেই গিয়েছিল এবং ফলত সেই হত্যার অপরাধে নৈতিকভাবে সে-ও অপরাধী। সেই দ্‌মিত্রিও প্রশ্ন করেছিল, কেন দুনিয়ায় এত দরিদ্র মানুষ কেন শিশুর কান্না, কেন তৃণভূমি ফসল ফলায় না? কেন দুনিয়ায় ধূসর দুঃস্থতা? 'why don't they feed the baby?' আইভানকে ঠিক ডস্টয়েভস্কির মুখপাত্র বলা চলে না, বরং বিপরীতটাই সত্য। তবু আলোশ্যকে যে আলংকারিক প্রশ্ন করেছিল আইভান সেই প্রশ্ন স্বয়ং লেখকেরও। তাঁর অন্যান্য লেখা পড়লেও বোঝা যায় শিশুদের দুঃখ, কান্না, কষ্ট এই মহৎ লেখকের বিবেককে বেশি পীড়িত করতো। একটি চিঠিতে তিনি 'the senselessness of the suffering of children' নিয়ে তাঁর তীব্র মর্মবেদনার কথা বলেছেন। তিনি যে উদ্ধার খুঁজছেন খ্রিস্টের করুণায়, সে অন্য ব্যাপার।

একজন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী খ্রিস্টের করুণায় নয়, সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের উপশমের পথ সন্ধান করেছিলেন। শৈশবে যিনি কঠোর দারিদ্র্য যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছিলেন সেই ভিক্টর সার্জ তাঁর বিপ্লবীজীবনের স্মৃতিকথায় লিখেছেন, শৈশবের অভিজ্ঞতার পাঠশালায় তিনি এক অলিখিত কম্যান্ডমেন্ট জেনে গিয়েছিলেন, 'Thou shalt be hungry.' কেন ক্ষুধায় শিশুরা, মানুষেরা পীড়িত হয়, সেই প্রশ্ন তার মনে জেগেছিল, সেই প্রশ্নই তাকে ভাবিয়েছে এবং সেই ভাবনার প্রণোদনায় সে সংগ্রামের পথে, বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে এই বালক কারণ 'Thou shalt fight back' বিপ্লবের জন্য লড়াই করবে, যাতে যে-সমাজব্যবস্থায় মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়, সেই সমাজকে বদলানো যায় নিজের চেয়ে দুই বছরের ছোট ভাইকে তিলে-তিলে অনাহারে মরতে দেখেছিলেন সার্জ— যেমন দেখেছিলেন কবি কীটস্ তাঁর ভাইকে 'Grows pale, and Spectre - thin and dies'. সার্জ ও তার বাবা দুজনে মিলে মৃত ভাইকে কবরখানায় সমাধিস্থ করতে নিয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানমনস্ক বাবা তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দেননি। আত্মা কাকে বলে জানত না ভিক্টর। ভাইকে তিলে-তিলে অনাহারে মরতে দেখেছিলেন সার্জ— যেমন দেখেছিলেন কবি কীটস্ তাঁর ভাইকে 'grows pale, and spectre thin and dies'. সার্জ ও তার বাবা দুজনে মিলে মৃত ভাইকে কবরখানার সমাধিস্থ করতে নিয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানমনস্ক বাবা তাঁর সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেননি। আত্মা কাকে বলে জানত না ভিক্টর। ভাইকে কবরখানায় রেখে এসে এই বালকের স্মরণে আসে সুলি প্রধোমের কবিতার লাইন,

Blue eyes, dark eyes, loved and lovely,
Exposed to the endless dawn,
From beyond the tomb still see
Tight though their lids be drawn.

সারা জীবন ধরে সব ক্ষুধার্ত বালকের চোখে সার্জ দেখেছেন অকালমৃত ভাই রাউলের দৃষ্টি। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, পরিত্যক্ত ক্ষুধার্ত কুড়িয়ে - বেঁচে থাকার পথের শিশুদেরই তিনি নিজের ভাই বলে জেনেছেন। ভিক্টর সার্জ লিখেছেন, 'Through-out the rest of my life it has been my fate always to find, in the undernourished urchins of the squares of Paris, Berlin

and Moscow, the same condemned faces of my tribe.' এই ক্ষুধার সত্য ভিক্টরের বিপ্লবী চেতনাকে শাণিত করে এবং তিনি বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত না হয়ে পারেন না। এই বৈষম্যমূলক সমাজকে, এই ক্ষুধার রাজ্যকে উৎখাত করতেই হবে এছিল তাঁর সংকল্প। বিপ্লবের পরে অবশ্য সোভিয়েট রাষ্টে যখন মানুষের প্রতি, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অবসান ঘটান হল, প্রতিষ্ঠিত হল একনায়কতন্ত্রী বীভৎস অপশাসন, তখন এই বহুজাতিক বিপ্লবী সেই রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধতা না করে পারেননি। ফলে তাঁকে বন্দী ও উৎপীড়িত হতে হয়। কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকের সর্বনাশ করে অতি দ্রুত শিল্পায়ন করতে গিয়ে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ডেকে আনা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আবার ক্ষুধার রাজ্য। যখন কাজাগিস্থানে বন্দি হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন সার্জ তখন তিনি দেখেছিলেন সামান্য রুটির টুকরোর জন্যে শিশুরা পরস্পরকে আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করছে। ক্ষুধার্ত চুরি করতে দ্বিধা করে না, ক্ষুধার্ত নারী শরীর বেচতে প্রস্তুত।

তিন

আমাদের তৃতীয় বিশ্ব তো ক্ষুধার রাজ্য। ক্ষুধা আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো বাস্তবতা বলে, আমাদের গল্পে-উপন্যাসে, আমাদের কবিতায় বারেবারে উঠে না এসে পারেই না। আমাদের জীবনের বিষয়ে সত্য কথা বলতে গেলে ক্ষুধার কথা বলতেই হবে। যেমন - যেমন মনে এল তেমনি-তেমনি নাম লিখছি, কিছু বাংলা ছোটগল্পের যার প্রধান বিষয় হল ক্ষুধা আর ক্ষুধার কাতরতা— রমেশচন্দ্র সেনের 'ডোমের চিতা', তারাশংকরের 'তিন শূন্য', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ক্ষুধা', মানিক বন্দ্যোপাধায়ের 'ছিনিয়ে খায়নি কেন?' মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত ও নিছক ভূতের গল্প', হাসান আজিজুল হকের 'জীবন ঘষে আগুন', অমর মিত্রের 'পার্বতীর বোশেখমাস', সৈকত রক্ষিতের 'শবর চরিত'। এই তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া চলে ক্রমাগত। আর এই ক্ষুধার অভিজ্ঞতা শুধু তো বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের। মনে পড়ছে মালয়ালাম ভাষায় বিখ্যাত লেখক এস. কে. পোট্টেকাটের (১৯১৩-১৯৮২) গল্প 'কুকুর' -এর কথা। রাস্তার কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্কের চিকিৎসার জন্য সরকারি সাহায্য মেলে এইকথা জেনে, ভূখা-পরিবারের কর্তা নিজের ঘুমন্ত ছেলের পায়ে কামড় বসায়। ছেলেকে কুকুরে কামড়িয়েছে এইকথা রটিয়ে সে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে টাকা আনতে রওয়ানা হয়। ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে এই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় তাকে। ক্ষুধা তাকে কুকুরের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। এমন ক্ষুধার্ত চরিত্রের মিছিল ভারতীয় আখ্যানে শেষহীন।

বিশেষ করে সহ্য করা যায় না ক্ষুধাকাতর শিশুর কান্না। আর 'senselessness of the suffering of children' বারে বারে স্থায়িত্ব পায় শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। কবিজীবনের একেবারে গোড়ায় যিনি লিখেছেন,

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে। (যমুনাবতী)

সেই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বারে-বারে আসে নিরন্ন ক্ষুধার্ত ভিখারি বালক- বালিকার ছবি। 'কে চায় সুন্দর কথা আর,/ দু-একটি সত্যি শুধু বলো।' আমাদের সমাজ - সংসার সম্বন্ধে নিখাদ সত্য কথা বলার কারণেই এইসব ভিখারি ক্ষুধাকাতর বালক-বালিকার প্রতিমা তাঁর কবিতায়। এইসব ছবি নগ্ন করে দেয় আমাদের বৈষম্যপীড়িত সমাজের বিন্যাসকে, যে বিন্যাস - ব্যবস্থাকে, এই 'দৃষ্টিহীন বধির সমাজ' -কে আমরা প্রায় যেন স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি।

সি আই টি রোডের বাঁকে পাথরকুচির উপর
হাত ছড়িয়ে দিয়ে
ঘুমিয়ে আছে আমার মেয়ে
বুকের কাছে এনামেলের বাটি। (ভয়)

সারাদিন বৃষ্টি ঝরছে ওর ভিক্ষার উপর, বোঝা যায় না কোন্‌টা বৃষ্টির জল কোন্‌টা বা কান্না। মাঝে-মাঝে সে কেঁদে ওঠে, অনাথ মেয়েরা যেমন কাঁদে। ভিখারি মেয়ে হতেই পারত নিজের মেয়ে— 'আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে'। কখনো আবার ভিখারির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান এই কবি, 'নিচু হয়ে বসে আছি পথের কিনারে, হাতে বাটি।' সারা শহরে একই দৃশ্য— সি আই টি রোড থেকে কলেজ স্ট্রিট,

কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা চতুর্ভুজ
তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে হঠাৎ উলটো হাতে
আলস্যময় বাটি ভরে যায় করুণাতে করুণাতে। (ভিখারি)

অবস্থাপন্নেরা যখন চড়ুইভাতি করে তখন ভুক্তাবশেষের দিকে এগিয়ে আসে শুধু লুব্ধ কাকেরা নয়, সন্তর্পণে ইতর শিশুরাও। অন্যদিকে,

সন্ধ্যাবেলার ঝলমলে চৌরাস্তায়
ছুটন্ত গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে
হাত গলিয়ে যখন ধূপকাঠি বেচতে চাইছিল
খালি ঘায়ে উশকোখুশকো চুলে পাঁচবছরের ইজের-পরা মেয়েটা...(বিস্ফোরণ)

তখন আমরা বলেছিলাম 'না', আমরা বলেছিলাম 'ভাগ্', আর তখন 'ঘরে রেখে-আশা শিশুটির মুখখানা ঝলক দিয়ে জেগে ওঠা ছাড়া/আর কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি কোথাও কোনোখানে...।' ধূপকাঠি বেচতে-চাওয়া ভিখারি বলিকা আর আমাদের ঘরে স্নেহে -নিরাপত্তায় বড়ো হতে থাকা শিশুটির প্রতিতুলনার সংঘর্ষে তো বিস্ফোরণ ঘটবারই কথা। কিন্তু কিছুই ঘটে না, জীবনের ছন্দে কোনো পতন ঘটে না।

'কিসের সুখে সহাস মুখে/ নাচিছ বাছনি'। স্টেশনের প্লাটফর্মে ক্ষুধাকাতর ভিখারির উশকোখুশকো চুল, গায়ে খড়ি-ওঠা ছেলেমেয়েরাও নাচে, কিন্তু দুয়ার-পাশে হেরিয়া নাচনি কোনো জননী হাসে না। কারণ এই ভিখারি বাচ্চা তিনটির মৃত মায়ের মুখে তখন মাছির ভনভনানি, একটু পরেই মুদ্দোফরাস এসে তার শব নিয়ে যাবে মর্গে। স্টেশনের ব্যস্ততায়, কুলিদের দৌড়ঝাঁপের মাঝখানে,

স্টেশনের প্লাটফর্মে রাত দশটায়
তিন-তিনটে বাচ্চা নেচে চলেছে
তাদের শায়িত মায়ের চারপাশ ঘিরে।...
তার মাঝখানে
অফুরান হাসির শব্দে গোল হয়ে
বাচ্চা কটা ঘুরছে মাকে ঘিরে, এখনই উঠে তাদের খেতে দেবে মা...
আর বাচ্চা তিনটে নেচে চলেছে নেচেই চলেছে...(মা)

রবীন্দ্রনাথের শিশু প্রয়াতা মাকে ডেকেছিল, 'তুই আয় মা, ফিরে আয়— ।/ এত ডাকি, দিবি নে সাড়া।' ভাতের আশায় নেচে-নেচে যাওয়া প্লাটফর্মের বাচ্চা তিনটে মাকে ডাকে না, কারণ তারা জানে একটু পরেই মা উঠবে বসবে আর তাদের ভাত খেতে দেবে!

ক্ষুধার নীরব সন্ত্রাসের পাশাপাশি দেশে-দেশে মৃত্যু ডেকে আনে অন্যরকমের সন্ত্রাস—বন্দুকের গুলিতে, আগুনে, বোমার বীভৎস অতর্কিত বিস্ফোরণে। কখনও রাষ্ট্র, কখনও জঙ্গি, কখনও নিছক আততায়ী ভেঙে দেয় সস্নেহ সংসার— শিশুরা অনাথ, নিরাশ্রয় হয়ে যায়।

আট বছরের শিশু মৃত্যুভয় জপে সারাদিন
এতটুকু শিরোদেশে জমিয়ে তুলেছে শিরোভার। (সন্ত্রাস)

শিশুরা মৃত্যুভয় জপে সারাদিন কাশ্মিরে বা মণিপুরে বা জঙ্গলমহলে। যে কোনও ভয়ংকর শব্দেই তারা কাঁপে, কেঁপে উঠে মাকে আঁকড়ে ধরে বলে, 'ভেঙে যদি পড়ে সব? যাবে না কোথাও তুমি আর।' যতক্ষণ মা আছে ততক্ষণ সমূহ সর্বনাশের মধ্যেও অবলম্বন আছে। যখন স্বপ্নের ভিতরে ঘোরে 'শবেরক্তে মাখামাখি ছবি', যখন চারিদিকে আগুনের লেলিহ শিখা, আর পাখির শিস্ নেই, তখন আট বছরের দাদাকে সান্ত্বনা দিয়ে সন্ত্রস্ত বোন বলে, 'ওভাবে বলছিস কেন? এখনও তো বেঁচেই আছিস!' আট বছরের, চারবছরের শিশুদের বেঁচে থাকাটাই এখন বিস্ময়ের ব্যাপার, এই সন্ত্রস্ত সময়ে। বিস্ময়চিহ্নে স্থায়িত্ব পায় সেই বিস্ময়।

'তাদের মুখে ক্ষত শুধু', এই শিশুদের— সন্ত্রাসের ক্ষত, ক্ষুধার ক্ষত প্রধানত। এই শিশুদের কথা বারে- বারে বলেন শঙ্খ ঘোষ,

তাদের আহত অভিমান
ভরে রেখে গেছে ঘরবাড়ি
তাদের আহত অভিমানে
এ-বাতাস হয়ে আছে ভারী। (পথ)

এই শিশুদের পূর্বসংস্কারমুক্ত নজর দিয়ে দেখলে সম্রাটের নতুন পোশাকে দেখা যায় রাজা আসলে উলঙ্গ। সমাজের বহিরাবরণ ঘুচে যায়, সমাজের উলঙ্গ চেহারা দেখা যায় শিশুর চোখ দিয়ে দেখলে। বাপজানকে ডেকে তাই বালক বলতে পারে 'কইলকাত্তার পথেঘাটে,' সমস্ত নাগরিক আড়ম্বর আর রোশনাইয়ের আড়ালে 'যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্যিকালের মরা পুকুর/ শাওলাপচা ভাসে।' আকণ্ঠ ভিক্ষুক বধির গৃহস্থের কানে বারেবারে হানা দেয়, ভাঙতে চায় তার স্থবিরতা। ভিখিরি ছেলে তীব্র অভিমানে প্রতিবাদ জানায়,

আগে বললেন, গা রে খোকা
পরে বলবেন, মাপ করো...
আগে বলবেন, গতর খাটো
পরে মারবেন লাথি...
বেশ করেছি ভেক ধরেছি
বাঁচিয়ে রাখি জান
দূরের থেকে দেখি সবার
দরদভরা টান

গাব না আর গান এবার
গাব না আর গান। (ভিখিরি ছেলের অভিমান)

গরির অনাহারী ঘরের মেয়ে মাকে বলে,

বেচিস না মা বেচিস না
বেচিস না আমায়
ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়
তুই আমাকে খা... (কালযমুনা)

বেচে-দেওয়া মেয়েকে বীভৎস নিয়তির অন্ধকারে চলে যেতে হয়। তাকে ছিঁড়ে খায় পুলিশ দালাল বাড়িওয়ালি আর খদ্দের। এই মেয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তার মাকে, মা যেন আর কোনো বোনের জন্ম না দেয়, কারণ সেই বোনকেও হয়তো বেচতে হবে। এইসব ভিখারি ভিখারিণী বালক-বালিকার অস্তিত্ব, এইসব বেচে-দেওয়া নাবালিকাদের অস্তিত্ব আমাদের শতকরা দশজনের অতিঝলমলে

সমাজে গ্রহণ লাগায়। ওদের অস্তিত্ব সমাজ-বৈষম্যকে উলঙ্গ করে দেয়, আমাদের লজ্জিত করে।

বাবুদের লজ্জা হলো
আমি যে কুড়িয়ে খাব
সেটা ঠিক সইল না আর...

আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শমরখাকী
খুঁটে পাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়। (লজ্জা)

যে-ভিখারিদের উপস্থিতির জন্য সুবোদের লজ্জা, তাদের সরিয়ে দিতে হবে। বস্তি উঠিয়ে উন্নয়ন করতে হবে, যাতে দারিদ্র্যের চিহ্ন না থাকে, যাতে সব ঝলমলে হতে পারে, মলে-মলে উজ্জ্বল হতে পারে। যখন উন্নয়নের অজুহাতে উৎখাতের আয়োজন হয়, তখন শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ভিখারি বালক বলে,

থাক সে পুরোনো কাসুন্দি
যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক
যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
ভাঙবার শুধু সময় চাই...

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড়কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই-না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ। (ভিখিরির আবার পছন্দ)

কিন্তু 'ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো 'ঠাঁই', এক সময় আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায় তারা থাকবে না, উৎখাতের নিয়তিকে তারা ভবিতব্য বলে মানবে না, একদিন পায়ে তলা থেকে দানা কুড়িয়ে নেবে না। অভিমান উত্তীর্ণ হবে প্রতিবাদে
প্রতিরোধে, তখন বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারে 'বাংলা থেকে কিউবা থেকে ঘানা।'

এই শিশুরাই হয়ে উঠে কবির কবিতায় আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের প্রতিমা। বন্যার জল দেশ ঘিরে ধরে আঘাতে-আঘাতে, মগ্ন প্রাচীরের মতো ধ্বসে যায় আমাদের স্থিরতা, স্থিতিশীলতা; শিশুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অস্থির জলরাশি—'ভাসমান চালে শুধু একা বসে থাকে শিশু'। আমাদের সব উন্নয়ন, দেশজুড়ে যে অগণ্য বিপণি ' যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়'। মুক্তধারার স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে অম্বার আর্তকণ্ঠ ভেসে আসে 'সুমন, সুমন'। এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন দু' -হাত জোড়া হাতে থাকে নিঃস্ব দেহ নীল শিশু। এই শিশুই দেশ, এই দেশ এই বালক প্রশ্ন করে,

কোথায় আমার দেশ কোন্ স্থিতি মৃত্তিকার কূল
কোন চোখে চোখ রেখে বুকের আকাশ ভরে মেঘে
দেশদেশান্তর কালকালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয়।...

এইসব আতংকিত, সন্ত্রস্ত শিশু আমারই, এই অনাহার ক্লিষ্ট মলিন - মুখ- ভিখারি শিশু বালক-বালিকা আমরাই, পরিচয়হীন গোত্রহীন ভিখারি আমরাই। তাই,

আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে
আমাদের শিশুদের শব
ছড়ানো রয়েছে কাছে দূরে।...

আমাদের ইতিহাস নেই
অথবা এমনই ইতিহাস
আমাদের চোখমুখ ঢাকা
আমরা ভিখারি বারোমাস... (আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি)